জেলা পরিষদ নির্বাচন চিত্র ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের তথ্য পর্যালোচনা

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৭ জানুয়ারি ২০১৭)

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিষ্ঠান জেলা পরিষদ। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রথম বারের মত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিষ্ঠানটির নির্বাচন। সারাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কুষ্টিয়া ও বগুড়া জেলায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। ফলে এই পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৫৯টি জেলায়।

২০০০ সালে প্রথম জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও পূর্বে কখনো নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত আইনের আওতায় ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ২০১৬ সালে আইনে সামান্য কিছু সংশোধনী এনে এই প্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রণীত আইনের কিছু বিষয় সম্পর্কে বিশেষ করে সরাসরি জনগণের ভোটের পরিবর্তে নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটে জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার বিধানটিকে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও, প্রথমবারের মত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ গঠনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। পাশাপাশি গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে আমরা এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা, কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সফলভাবে এই নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন, এমনকি নির্বাচনের পর পর্যন্ত যে চিত্র আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তাতে আমাদের সেই আশাবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলেই মনে হয়। জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে নির্বাচন চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- আইনগতভাবে এই নির্বাচন নির্দলীয় হলেও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলীয়ভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়।
- অন্য বড় কোন রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী না দেওয়ায় এই নির্বাচন ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি এবং কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনাও সৃষ্টি হয়নি।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে।
- দলের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বিদ্রোহী প্রার্থীদের ওপর প্রার্থীতা প্রত্যাহারে চাপ না থাকলেও স্থানীয়ভাবে ছিল।
- জেলা পরিষদ নির্বাচন নির্দলীয় হলেও নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটারদের অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনে বিজয়ী।
- দশম জাতীয় সংসদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে ২১টি জেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থীসহ অসংখ্য প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
- এই নির্বাচনকে সামনে রেখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংসদ সদস্য কর্তৃক ব্যাপকভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটানো হয়। অনেক সংসদ সদস্য টিআর, কাবিখা ও অর্থ বরাদ্দের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদের কাছে নিজ প্রার্থীর পক্ষে ভোট চান।
- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের এলাকা ছাড়ার আহ্বান জানানোসহ নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে স্পীকার কর্তৃক নোটিশ করা হলেও অনেক সংসদ সদস্য তা উপেক্ষা করে এলাকাতেই অবস্থান করেছেন (গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সংখ্যা কমপক্ষে ১১ জন)। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।
- সারাদেশব্যাপী ব্যাপকভাবে অর্থ বা উপহারের বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের ঘটনা ঘটেছে। অনেক ভোটারকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনও দেখানো হয়েছে।
- নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে।
- নির্বাচনের পূর্বে টাকা বিতরণ নিয়ে, নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে, এমনকি নির্বাচন পরবর্তীকালেও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে পোলিং এজেন্টসহ বেশ কয়েক জনের আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। একটি জেলায় ভোট কারচুপির অভিযোগে সড়ক অবরোধের ঘটনাও ঘটেছে। উল্লেখ্য ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, নড়াইল, মাগুরা, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধাওয়া-পাল্টা ও সংঘর্ষের মত ঘটনাসমূহ ঘটে।
- টাকা নিয়ে ভোট না দেওয়ায় নির্বাচনের পর ভোটারের কাছ থেকে টাকা ফেরত নেওয়া এবং কোনো কোনো এলাকায় ভোটারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
- মামলা তথা রুলনিশি মাথায় নিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা পরিষদ নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও গণমাধ্যমে দলভিত্তিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল বা বিজয়ীদের নাম সম্বলিত গেজেটের কপি সন্নিবেশিত হয়নি। তবে ইতোমধ্যেই জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ২১ জনসহ এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ৪৬ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ১২ জন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ১জন নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য চেয়ারম্যান পদে রংপুর, পাবনা, জামালপুর ও সুনামগঞ্জে জেলা থেকে একজন করে মোট ৪ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি রংপুর জেলার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত এডভোকেট ছাফিয়া খানম।

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের তথ্য পর্যালোচনা

২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৪৯ জন প্রার্থীর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও কুষ্টিয়া ও বগুড়ার নির্বাচন স্থগিত থাকায় ৫৯টি জেলায় মোট প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৫ জন। এছাড়াও সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে ৮০৬ জন এবং সাধারণ সদস্য পদে ২,৯৮৬ জন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনটি পদে সর্বমোট প্রার্থী সংখ্যা দাড়ায় ৩,৯৩৭ জন। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে সর্বমোট ৬৩,১৪৩ জন ভোটার তালিকাভূক্ত ছিলেন; যার মধ্যে ৪৮,৩৪৩ জন পুরুষ এবং ১৪,৮০০ জন নারী।

আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। এখন আমরা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের তথ্যসমূহ উপস্থাপন করছি। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
৪	১	৮	৩৪	১১	১	৫৯	
৬.৭৭%	১.৬৯%	১৩.৫৫%	৫৭.৬২%	১৮.৬৪%	১.৬৯%	১০০%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ৪৫ জনের (৭৬.২৭%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। এস এস সি বা তার কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন রয়েছেন ৫ জন (৮.৪৭%) জনের। ৪ জনের (৬.৭৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসির কম।
- পঞ্চগড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: আমানুল্লাহ বাচ্চুর শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী ও মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: গোলাম রসুলের শিক্ষাগত যোগ্যতা নবম শ্রেণী। যশোর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ হাদীউজ্জামান ও কক্সবাজার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাক আহমদ চৌধুরী হলফনামায় তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা 'স্বশিক্ষিত' বলে উল্লেখ করেছেন। শরীয়তপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ছাবেদুর রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। মাগুরা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব পঙ্কজ কুমার কুণ্ডুর শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত হলফনামার পাতাটি নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে নেই।
- দেখা যায় যে, চেয়ারম্যানদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত হলেও স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদের নেতৃত্ব দানকারী চেয়ারম্যান পদটিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৪ (৬.৭৭%) জন রয়েছেন।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর যোগ্যতাসম্পন্ন ৭০.৪৬% (১৪৯ জনের মধ্যে ১০৫ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন; নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৭৬.২৭% (৫৯ জনের মধ্যে ৪৪ জন)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ১৫ জন (১০.০৬%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচিতদের মধ্যে এই সংখ্যা ৪ জন (৬.৭৭%)।
- বিশ্লেষণে এ কথা বলা যায় যে, উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার শতকরা হার (৭৬.২৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় (৭০.৪৬%) বেশি। পাশাপাশি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার শতকরা হার (৬.৭৭%) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় (১০.০৬%)। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, স্বল্প শিক্ষিতদের তুলনায় ভোটার উচ্চ শিক্ষিতদের ভোট দিয়েছেন বেশি।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
৩	৩৮	৫	৮	০	৫	০	৫৯	
৫.০৮%	৬৪.৪০%	৮.৪৭%	১৩.৫৫%	০%	৮.৪৭%	০%	১০০%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৮ (৬৪.৪০%) জন প্রার্থীর পেশা ব্যবসা, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ (১৩.৫৫%) আইনজীবি।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত জেলা পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর শতকরা হার ৫৭.০৪% (১৪৯ জনের মধ্যে ৮৫ জন) হলেও নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৬৪.৪০% (৫৯ জনের মধ্যে ৩৮জন)। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
২ ৩.৩৮%	১৫ ২৫.৪২%	০ ০%	২ ৩.৩৮%	১ ১.৬৯%	০ ০%	৫৯ ১০০%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ২ জনের (৩.৩৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৫ জনের (২৫.৪২%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের (১.৬৯%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় অতীতে মামলা ছিল ২ জনের (৩.৩৮%) বিরুদ্ধে। এই দুইজন হচ্ছেন মুন্সীগঞ্জের চেয়ারম্যান জনাব মো: মহিউদ্দিন এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো: গোলাম রসুল।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ১৪৯ জন মধ্যে ১৫ জনের (১০.০৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৭ জনের (২৪.৮৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৮ জনের (৫.৩৬%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারার ক্ষেত্রে ২ জনের (১.৩৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের (২.০১%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অতীত মামলার ক্ষেত্রটি ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই মামলা সংশ্লিষ্টদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কম।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৩ ৫.০৮%	১৯ ৩২.২০%	২৫ ৪২.৩৭%	৩ ৫.০৮%	৩ ৫.০৮%	৩ ৫.০৮%	৩ ৫.০৮%	৫৯ ১০০%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ২২ জন (৩৭.২৮%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয় করেন। বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৩ জন (৫.০৮%)। তাঁরা হচ্ছেন জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী (বার্ষিক আয় ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭১৭ টাকা), বরিশাল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মইদুল ইসলাম (বার্ষিক আয় ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩২৩ টাকা) গাজীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আখতার উজ্জামান (বার্ষিক আয় ১ কোটি ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ টাকা)। ৩ জন (৫.০৮%) চেয়ারম্যান আয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয়কারী ৫১.৬৭% (১৪৯ জনের মধ্যে ৭৭ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৭.২৮% (৫৯ জন মধ্যে ২২ জন)। অপরদিকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ৪২.২৮% (১৪৯ জনের মধ্যে ৬৩ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৭.৬২% (৫৯ জন মধ্যে ৩৪ জন)। বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৬ জন (৪.০২%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩ জন (৫.০৮%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও, অপেক্ষাকৃত অধিক আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
৯ ১৫.২৫%	২১ ৩৫.৫৯%	৮ ১৩.৫৫%	১১ ১৮.৬৪%	৭ ১১.৮৬%	২ ৩.৩৮%	১ ১.৬৯%	৫৯ ১০০%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ৯ জনের (১৫.২৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে। কোটির টাকার অধিক সম্পদের মালিকও রয়েছেন ৯ জন (১৫.২৫%)। অন্যান্য ৪০ জনের (৬৭.৭৯%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষের অধিক ও কোটি টাকার কম। ৫ কোটি টাকার

অধিক সম্পদের মালিক রয়েছে ২ জন (৩.৩৮%)। তাঁরা হচ্ছেন, জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী (সম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি ৯ লক্ষ ৩ হাজার ২২৭ টাকা) এবং পিরোজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: মহিউদ্দীন মহারাজ (সম্পদের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৩ হাজার ১৫৬ টাকা)।

- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের অধিকারী ২৯.৫৩% (১৪৯ জনের মধ্যে ৪৪ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৫.২৫% (৫৯ জনের মধ্যে ৯ জন)। অপরদিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ২৬.৮৪% (১৪৯ জনের মধ্যে ৪০ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩.৮৯% (৫৯ জনের মধ্যে ২০ জন)। কোটির টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১৪.০৯% (১৪৯ জনের মধ্যে ২১ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৫.২৫% (৫৯ জনের মধ্যে ৯ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, স্বল্প সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও, অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- তবে এও সত্য যে, প্রার্থীদের হলফনামায় সম্পদের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই বর্তমান সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যেহেতু তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয় না, তাই তথ্য গোপনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

৫. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা	মন্তব্য
০ ০%	২ ৩.৩৮%	১ ১.৬৯%	০ ০%	০ ০%	১ ১.৬৯%	৫৯ ১০০%	৪ ৬.৭৭%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে মাত্র ৪ জন (৬.৭৭%) ঋণ গ্রহীতা। ঋণ গ্রহীতা ৪ জনের মধ্যে ১ জন (২৫%) ৫ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন। তিনি হলেন, দিনাজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আজিজুল ইমাম চৌধুরী (ঋণের পরিমাণ ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১০.৭৩% (১৪৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জন) ঋণ গ্রহীতা থাকলেও নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে তা ৬.৭৭%।
- বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার কম।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী	মন্তব্য
৫ ৮.৪৭%	২ ৩.৩৮%	১০ ১৬.৯৪%	২ ৩.৩৮%	৩ ৫.০৮%	১ ১.৬৯%	১ ১.৬৯%	৫৯ ১০০%	২৪ ৪০.৬৭%	

- নবনির্বাচিত ৫৯ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে মাত্র ২৪ (৪০.৬৭%) জনের আয়কর প্রদানের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কর প্রদানকারী ২৪ জনের মধ্যে ৭ জন (২৯.১৬%) ১০ হাজার টাকার কম এবং ৫ জন (২০.৮৩%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা অধিক (প্রদত্ত করের পরিমাণ ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০৪ টাকা) কর প্রদান করেছেন ঝিনাইদহের জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব কনক কান্তি দাস এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার অধিক (প্রদত্ত করের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৫৫ টাকা) কর প্রদান করেছেন বাগেরহাটের জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শেখ কামরুজ্জামান টুকু।
- নির্বাচনে ৩৩.৫৫% (১৪৯ জনের মধ্যে ৫০ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪০.৬৭% (৫৯ জনের মধ্যে ২৪ জন)।
- বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি আমরা এও মনে করি যে, আয়কর সংক্রান্ত সকল কাগজ-পত্র জমা না দেয়ার অর্থ মনোনয়ন পত্র অসম্পূর্ণ থাকা। সেক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র বাতিলযোগ্য। শুধুমাত্র আয়কর বিবরণীই নয়, তথ্য ফরমের অনেক কলামই কোনো কোনো প্রার্থী পূরণ করেন না। তারপরেও নির্বাচন কমিশন এসব ব্যাপারে উদাসিন; যা গ্রহণযোগ্য নয়।

পরিশেষে আমরা আবারও জেলা পরিষদ আইন নিয়ে কথা বলতে চাই। সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা মনে করি জেলা পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করা উচিৎ। স্থানীয় সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য নির্বাচক মণ্ডলী একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এই নির্বাচকমণ্ডলীকে সাধারণ ভোটাররা স্ব স্ব এলাকার বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন; অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলী হিসেবে কাজ করার জন্য নয়। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন হওয়ার পর আমাদের আজকের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ২০০২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জেলায় জেলায় সরকার' গ্রন্থে এই আইনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে এই আইন বাস্তবায়িত হলে একটি 'অথর্ব জেলা পরিষদ' গঠিত হবে।

শুধুমাত্র নির্বাচন পদ্ধতিই নয়, আইনে বর্ণিত আরও কিছু বিষয়ের সাথে সুজন একমত নয়। আইনের সামগ্রীক সকল বিষয়কে মাথায় রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা প্রশাসনসহ জেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারের সকল বিভাগকে জেলা পরিষদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। উপজেলা পর্যায়েও একই ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচক মন্ডলীর পরিবর্তে সরাসরি জনগণের ভোটে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের জন্য নির্বাচনী এলাকাকে বড় মনে হলে, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে ১৫টি ওয়ার্ডে ১৫ জন সদস্য এবং ৫জন সংরক্ষিত সদস্য নির্বাচিত হবেন। পরে তাঁদের ভোটে তাঁদের ভেতর থেকেই একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ঘুর্ণায়মান আসন সংরক্ষণ পদ্ধতির বিধান করা যেতে পারে। ওয়ার্ডের পরিধিও জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের জেলা পরিষদের উপদেষ্টার রাখার বিধান বিলুপ্ত করতে হবে।
- চেয়ারম্যানসহ জেলা পরিষদের সদস্যদের আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান পরিবর্তন করতে হবে অথবা সকল ধরনের জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধান প্রবর্তন করতে হবে।
- জেলা পরিষদের বাধ্যতামূলক কার্যাবলীতে বর্ণিত (প্রথম তফসিল) উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার ওপর জেলা পরিষদের তদারকীমূলক ভূমিকা প্রত্যাহার করতে হবে। কেননা ধারণাগতভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই স্বশাসিত। তাছাড়া এই বিধান রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা মনে করি উপরোল্লেখিত পরিবর্তনসমূহ আনার মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ আইনটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।